৯/১১'র চার বছর

নিঃসঙ্গ যুক্তরাষ্ট্র

সন্ত্রাসী হামলার পর বিশ্ববাসী যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়েছিল। চার বছর পর দেশটি আজ বড়ই একা। লিখেছেন **জামান আরশাদ**

২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের বিশ্ববাণিজ্য কেন্দ্রে আত্মঘাতী সন্ত্রাসী হামলার পর সারা বিশ্বের মানুষ মার্কিন জনগণের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। এই বর্বরোচিত হামলার প্রতিবাদে সারা বিশ্বের শান্তিকামী মানুষ রাস্তায় নেমেছিল। ধিক্কার জানিয়েছিল হামলাকারীদের। ওই হামলায় নিহত প্রায় ৫ হাজার লোকের স্মরণে প্রার্থনা করেছিল সারা বিশ্ব। কারণ নিহতরা ছিলেন নিরপরাধ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি কট্টরপন্থি সন্ত্রাসের বলি হতে হয়েছিলো তাদের।

১১ সেপ্টেম্বরের সেই ভয়াবহতম দুঃসহ ট্র্যাজেডির চার বছর পূর্ণ হলো। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য, চার বছর আগে যে আমেরিকা প্রায় সারা বিশ্বের মানুষকে কাছে পেয়েছিল আজ সেই আমেরিকা বড়ই একা। তার পাশে যারা ছিল তাদের অনেকে চলে গেছে, যারা এখনো আছে তাদের ওপর রয়েছে তীব্র অভ্যন্তরীণ চাপ। এ অবস্থায় আমেরিকা আজ সত্যি অসহায়। বর্তমানে আমেরিকা সন্ত্রাসীদের কাছে পরাস্ত, বিধ্বস্ত, লজ্জিত একটি দেশ।

চার বছর আগে যুক্তরাষ্ট্র সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশ নতুন একটি তত্ত্ব চালু করেন। সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ- এ তত্ত্বের প্রচলন ঘটিয়ে বুশ শুরু করলেন নির্দয় এক হিংস্র খেলা। 'হয় তুমি আমাদের পক্ষে, নয়তো সন্ত্রাসীদের'- এরকম একতরফা তত্ত্ব দিয়ে বিভক্ত করে ফেলা হলো বিশ্বকে। ঘোষণা করা হলো ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়া- এই তিনটি দেশ শয়তানের দুষ্টচক্র। এদের পরাজিত করতে হবে। নইলে যুক্তরাষ্ট্র বিপদমুক্ত নয়। আজ উত্তর কোরিয়া আরো শক্তিশালী। তাদের পরমাণু বোমা আছে, এটা তারা সদম্ভে প্রকাশ করেছে। ইরানও চালিয়ে যাচ্ছে তাদের পরমাণু কেন্দ্রে ইউরেনিয়াম সমৃদ্ধকরণের কাজ। হ্যাঁ, ইরাক তারা দখল করতে পেরেছে। তবে সে দেশটি থেকে প্রতিদিন জ্বলন্ত লাভার উদগীরণ হচ্ছে। তাতে পুড়ে মরছে মার্কিনিরা। শিগগিরই সেখান থেকে তাদের পরাজিত হয়ে ফিরে যেতে হবে।

৯/১১'র পর বিশ্ব যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়িয়েছিল

এই চার বছরে আন্তর্জাতিক সন্ত্রাস তো দমন করা যায়নি, তারপর বিভিন্ন দেশে বোমা হামলা হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার বালি, স্পেনের মাদ্রিদ, মিশরের শার্ম আল শেখ, ব্রিটেনের লন্ডন, অতি সম্প্রতি বাংলাদেশের ৬৩টি জেলায় একযোগে বোমা হামলার মাধ্যমে প্রমাণ হয়েছে, সন্ত্রাসীদের হাত কত দূর লম্বা।

১১ সেপ্টেম্বরের হামলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে দায়ী করে, যে লাদেন যুক্তরাষ্ট্রেরই তৈরি। আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে তাকে ব্যবহার করেছিল যুক্তরাষ্ট্র। মার্কিনিদের তরফ থেকে অভিযোগ করা হয়, লাদেনের প্রধান সহযোগী আফগানিস্তানে তালেবান নেতা মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। আল-কায়েদা নেতাদের আফগানিস্তানে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে- এ অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সহায়তায় সে দেশে অভিযান চালায়। প্রায় বিনাযুদ্ধে রাজধানী কাবুল থেকে চলে যায় তালেবান বাহিনী।

এর পরের ঘটনা আমাদের জানা। সেখানে মার্কিনপন্থি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন, নির্বাচনের নামে প্রহসন, মার্কিন তাবেদার হামিদ কারজাইর বিজয়। কিন্তু মূল যে প্রশ্ন, যুক্তরাষ্ট্র সেখানে হামলা করেছিল তাদের ভাষায় সন্ত্রাসী বিতাড়নের জন্য, আসলে কি সন্ত্রাসীরা বিতাড়িত হয়েছে? নিশ্চিহ্ন হয়েছে? মোটেই না। তালেবান সার্থকরা সেখানে অবস্থানরত মার্কিন সৈন্যদের ওপর মুহুর্মুহু অভিযান চালাচ্ছে। এ খবর আমরা নিয়মিত পাচ্ছি। আসন্ন পার্লামেন্ট নির্বাচনেও তালেবান নেতারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এখন যে পরিস্থিতি, যুক্তরাষ্ট্রকে হয়তো আফগানিস্তান থেকে সরে আসতে হবে।

আফগানিস্তানে হামলার পর ডিক চেনি, কন্ডোলিৎসা রাইস, পল উলফোভিৎসরা পরামর্শ দেয় ইরাক আক্রমণ করতে হবে। কারণ ইরাকের হাতে ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্র আছে। এই অস্ত্র সন্ত্রাসীদের কাছে চলে যেতে পারে। এই অস্ত্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ নিরাপদ নয়। অপরদিকে ইরাকি নেতা সাদ্দাম হোসেন বারবার বলতে থাকেন, তাদের হাতে কোনো জীবাণু বা রাসায়নিক অস্ত্র নেই, আর তারা কোনো আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীকে আশ্রয় দিচ্ছে না। জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দলের প্রধান হ্যান্স ব্লিক্স তার টিম নিয়ে একাধিকবার ইরাক সফর করেন। তিনি প্রতিবেদন জমা দেন- ইরাকে এ ধরনের কোনো মারণাস্ত্র নেই। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের তা পছন্দ হয় না। তারা বলে, সাদ্দাম লুকিয়ে ফেলেছেন। এভাবে একদিন ২০০৩ সালের ২০ মার্চ তারা ইরাকে হামলা চালায়। সঙ্গে পায় টনি ব্লেয়ারের ইংল্যান্ড, জন হাওয়ার্ডের অস্ট্রেলিয়া এবং স্পেনকে। এভাবে দুই মাস একতরফা অভিযানের পর শেষ হয় ইরাক দখল।

তারও কিছুদিন পর গ্রেপ্তার হন সাদ্দাম হোসেন। এর মধ্যেই সেখানে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। নির্বাচনে সাদ্দামপন্থিদের কোণঠাসা করা হয়।

আসলে আজকের ইরাক হয়ে পড়েছে এক অগ্নিগর্ভ। একদিকে বিদ্রোহীদের হামলা, অপরদিকে মার্কিন ও ইরাকি সেনাদের অত্যাচারে সেখানকার সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। শহরগুলোতে নাগরিক সুবিধা বলতে কিছু নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো, বুশ ওই দেশ আক্রমণ করেছিলেন সন্ত্রাসীদের বিতাড়িত করার জন্য। কিন্তু আজ পুরো দেশ সন্ত্রাসীদের কারখানায় পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে শীর্ষ সন্ত্রাসীরা সেখানে ঢুকে পড়েছে। সাদ্দাম যেসব সন্ত্রাসীকে শায়েস্তা করেছিলেন, তারাই আজ সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে।

আরেকটি বিষয় হলো, ইরাক আক্রমণে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যারা হাত মিলিয়েছিল, তারা পরে সরে দাঁড়াতে শুরু করে। মাদ্রিদে ট্রেনে বোমা হামলার পর তারা সৈন্য প্রত্যাহার করে

বুশের নীতি দেশটিকে একঘরে করেছে

নেয়। আরো একাধিক দেশ সৈন্য প্রত্যাহারের ঘোষণা দিয়েছে। ব্রিটেন ও অস্ট্রেলিয়ার মতো কট্টর সমর্থকরাও জানিয়ে দিয়েছে, দেশ তীব্র চাপের মুখে থাকায় তারা এ অভিযানে আর সৈন্য বাড়াতে পারবে না। অতএব, এটা নিশ্চিত যে, এই আন্তর্জাতিক কোয়ালিশন আর জোরদার হচ্ছে না।

চার বছরে দুটো যুদ্ধ করে, বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে এই হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাপ্তি। যুক্তরাষ্ট্র যদি মনে করে তারা আফগানিস্তান ও ইরাকে তাদের অভিযান সফলভাবে শেষ করতে পেরেছে, সেটা হবে খুবই ভুল। আমেরিকা এখনো ওসামা বিন লাদেনকে ধরতে পারেনি, ধরতে পারেনি তার প্রধান সহযোগী আইমান আল জাওয়াহিরিকে, নাগাল পায়নি জারকাবির। আফগানিস্তানে তালেবানরা শক্তি সঞ্চয় করছে, তাদের হামলায় মারা যাচ্ছে আফগান সৈন্যসহ মার্কিন সৈন্যরা।

অপরদিকে ইরাক যুদ্ধে এরই মধ্যে ২০০ বিলিয়ন ডলার খরচ হয়ে গেছে। এখন প্রতিদিন সেখানে এক বিলিয়ন ডলার খরচ হচ্ছে। ওয়াশিংটন বলেছে, সব সন্ত্রাসী দমন এবং ইরাকে একটি কার্যকর সরকার প্রতিষ্ঠায় আরো ১০ বছর ইরাকে থাকতে হবে। তাতে কত খরচ হবে, তা বলছে না যুক্তরাষ্ট্র। এরই মধ্যে ইরাক থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য নিজ দেশে প্রচন্ড চাপের মুখে রয়েছেন বুশ। কিন্তু তিনি বলছেন, ইরাক থেকে যুক্তরাষ্ট্র সরে এলে সন্ত্রাসীরাই বিজয়ী হবে।

যুক্তরাষ্ট্র যে কতটা অসহায় তার প্রমাণ মিললো সম্প্রতি সেখানে চারটি অঙ্গরাজে হারিকেন ক্যাটরিনা আঘাত হানার পর। অন্তত ১০ হাজার লোক মারা গেছে এই ঝড়ে। শিয়াল-কুকুরের সঙ্গে রাস্তায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে মানুষের লাশ। আমেরিকার মতো 'সভ্য' দেশে এমন ঘটতে পারে এ ধারণা কেউ করে না।

যুক্তরাষ্ট্র আজ বিশ্ব সন্ত্রাস মোকাবেলায় ব্যর্থ। নিজ দেশে প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলায় ব্যর্থ। তার সম্মান বলতে আর কিছু নেই। যুক্তরাষ্ট্র আজ পরিশ্রান্ত, অসহায় একটি দেশ। নিউইয়র্ক টাইমসের নামজাদা কলাম লেখক টম ফ্রিডম্যানের ভাষায়, 'যুক্তরাষ্ট্রের ফুর্তির দিন শেষ।' আসুন আমরা অসহায় যুক্তরাষ্ট্রের পাশে দাঁড়াই!

৯/১১'র পর ভারত

বিমান ছিনতাই রোধে আইন

প্রায় ৬ বছর আগের ঘটনা। ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের একটি নিয়মিত বিমান ১৫০ জন যাত্রী নিয়ে কাঠমান্ডু থেকে দিল্লির উদ্দেশে উড়াল দেয়। যাত্রীদের প্রায় সবাই ভারতীয়। উড়ন্ত অবস্থায়ই ৫ জন সন্ত্রাসী বিমানটি নিয়ন্ত্রণে নেয়। ছিনতাইকৃত বিমানটি নিয়ে সোজা হাজির হয় তালেবান মুল্লুক আফগানিস্তানে। ১৫০ জন যাত্রীর জীবন বাঁচানোর জন্য ভারতে বন্দি ৩ জন ইসলামী জঙ্গিবাদীর মুক্তি দাবি করে ছিনতাইকারীরা। বেকায়দায় পড়ে ভারত সরকার। প্রথমদিকে অস্বীকৃতি জানালেও শেষ পর্যন্ত জিম্মি যাত্রীদের আত্মীয়স্বজন ও ক্রমবর্ধমান অভ্যন্তরীণ চাপে দাবি অনুযায়ী ৩ বন্দির মুক্তি দেয় তারা। রক্ষা পায় ১৫০ জন যাত্রীর জীবন।

কিন্তু মুক্তি পাবার পর এরা সন্ত্রাসী তৎপরতায় আরো সমৃদ্ধ হয়। ২০০২ সালে ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের সাংবাদিক ড্যানিয়েল পার্করকে হত্যা করার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল মুক্তিপ্রাপ্ত ওমর সাঈদ শেখ। মুক্তিপ্রাপ্ত অপর একজন মাওলানা মাসুদ মাজহার ছাড়া পাবার পর পরই একটি সন্ত্রাসবাদী সংগঠন গড়ে তোলে। এ গোষ্ঠীটই ২০০১ সালে ভারতের পার্লামেন্ট ভবনে রক্তাক্ত হামলা চালায়। সামনে এ ধরনের আরো হামলা চালানোর মিশন নিয়ে তারা কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর ধারণা। পরবর্তী সময়েও যদি এ ধরনের বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটে ভারত তা কীভাবে মোকাবেলা করবে তা নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল ১৯৯৯ সালের বিমান হাইজ্যাকের পরপরই। এরই রেশ ধরে সম্প্রতি ভারতে নিরাপত্তা বিভাগ বিমান ছিনতাই মোকাবেলা সম্পর্কিত একটি নীতিমালা কার্যকর করছে।

নতুন এই নীতিমালা অনুযায়ী ভারত কোনো অবস্থায়ই বিমান ছিনতাইকারীদের সঙ্গে কোনো প্রকার আপোসরফা করবে না। অপরদিকে নিরাপত্তা বাহিনীর যদি মনে হয় যে লুট হয়ে যাওয়া বিমানটি প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী ভবনসহ অন্য কোনো কৌশলগত স্থাপনার ওপর টুইনটাওয়ার ধরনের আক্রমণ চালাতে পারে, তবে কর্তৃপক্ষ সে ক্ষেত্রে যাত্রীবাহী বিমানটিকে গুলি করে ভূপাতিত করতে পারবে। এখন থেকে কোনো বিমান ছিনতাইয়ের ঘটনাকে ভারত দেখবে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আক্রমণ হিসেবে এবং যুতসই জবাব দেবে নিরাপত্তা বাহিনী।

পেশকৃত এ নীতিমালায় আরো বলা হয়েছে- ছিনতাইকৃত বিমান যতক্ষণ ভারতীয় ভূখণ্ডে থাকবে, ভারতীয় সামরিক বিমান তার সঙ্গে সঙ্গে থেকে নজরদারি করবে। সর্বাত্মক চেষ্টা করা হবে বিমানটিকে ভারতের মাটিতেই অবতরণ করানোর। এ ছাড়া অবতরণ করার পর ছিনতাইকৃত অবস্থায় সেটি যেন আর উড্ডীয়মান হতে না পারে সে ব্যবস্থাও করবে নিরাপত্তা বাহিনী।

ছিনতাইকৃত বিমানটি যদি এর নির্দিষ্ট রুট বাদ দিয়ে অন্য পথ ধরে, বিমান কন্ট্রোল অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ না করে এবং কন্ট্রোলরুম থেকে পাঠানো সিগনালের কোনো সাড়া না দেয় তবে বিমানটির গতিবিধি সন্দেহজনক এবং দুষ্কৃতকারী বিমান হিসেবে বিবেচনা করা হবে।

বিমানটি যদি এমন কোনো পথ ধরে এবং সরকারি ভবনসহ কোনো কৌশলগত অবস্থানের ওপর হামলে পড়তে পারে বলে সন্দেহ হয় তবে নীতিমালা অনুযায়ী সেটিকে গুলি করে ভূপাতিত করা হবে। তবে ভূপাতিত করার পূর্বে প্রতিরক্ষা মন্ত্রনালয়ের অনুমতি নিতে হবে। তবে নিরাপত্তা বিভাগের অনুমতি আদায়ের মতো পর্যাপ্ত সময় না পাওয়া গেলে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিরক্ষা অথবা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী যার সঙ্গেই প্রথম যোগাযোগ করা সম্ভব হবে তার অনুমতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেয়া যাবে। তবে এর চেয়েও কম সময়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হলে বিমানবাহিনীর কোনো উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার নির্দেশে ভূপাতিত করা যাবে, অপরদিকে ছিনতাইয়ের অবসান ঘটাতে বিমানের মধ্যে সশস্ত্র হামলাও চালাতে পারবে নিরাপত্তা বাহিনী।

অনুমোদিত এ নীতিমালা ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরো সংহত করার লক্ষ্য নিয়েই তৈরি করা হয়েছে। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এ নীতিমালা কখনো যদি প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয় তাহলে অনেক নির্দোষ মানুষের জীবনের অবসান ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কা করছেন অনেকেই। অপরদিকে ছিনতাইকৃত বিমানটিতে যদি সরকারের কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি থাকেন, সেই ক্ষেত্রে কীভাবে তা মোকাবেলা করা হবে, নীতিমালায় তা উল্লেখ করা হয়নি।

সুমন আহমেদ